ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, February, 2026, Page No. 60-64
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.270

রবীন্দ্রনাটকে সাধারণ জনতার বিবর্তনের রূপরেখা

ড. গৌতম চন্দ্র বাড়ৈ, *সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, বান্দোয়ান মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 23.12.2025; Accepted: 18.02.2026; Available online: 28.02.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In many of Rabindranath Tagore's plays, the crowd (the masses) plays a distinctive role. Although the thematic concerns vary from play to play, the overall nature of the crowd remains more or less similar across different times and contexts. In his early plays, cowardice and superstition are used as elements of course, rustic humour. In the later plays, however, the crowd gradually becomes more organised.

In *Prakritir Pratisodh*, the position of the common people, in contrast to ascetic life, remains confined to the trivialities of everyday existence. In *Raja O Rani*, although the crowd shows defiance against the king, in reality it remains leaderless and aimless. In *Bisarjan*, the collective traits of the crowd are marked by ignorance, cowardice, and religious fanaticism. In *Malini*, on the other hand, the crowd is not composed of uneducated villagers; rather, they are educated townspeople and Brahmins, yet they do not entirely shed their rustic mindset.

In *Prayashchitta* and *Achalayatan*, the crowd is not leaderless, but it fails due to a lack of discipline. The diversity of the populace in *Raja* lends the play its distinctiveness. In plays such as *Muktadhara*, *Raktakarabi*, and *Rather Rashi*, the nature of the crowd transcends the inertia of the earlier plays and points towards the search for a new path. This very rise of the common people constitutes the subject of the present article.

Keywords: Crowd, Rustic humour, Fear, Doubt, Leader lessness, Disorder, Driving force

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের নাটকগুলিতে জনতা চরিত্রের ব্যবহার ছিল বাইরে থেকে আরোপিত কিন্তু শেষ পর্বের নাটকগুলিতে কাহিনীর অপরিহার্য উপাদান রূপে গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে এই জনতা চরিত্র। ফলে তখন আর নাটক থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। প্রথম পর্বের নাটকগুলিতে জনতা চরিত্র ছিল বিশৃঙ্খল। তারা একত্রে মঞ্চে উপস্থিত হলেও তাদের মধ্যে ছিল না কোন সঙ্ঘবদ্ধতা। কিন্তু শেষদিকের নাটকগুলিতে জনতা চরিত্র একটি সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে। জনতা সম্পর্কে রবীন্দ্রকথা- 'মানুষ যতক্ষণ আপনাকে প্রকাশ না করিতেছে ততক্ষণ তাহা জনতা, যখনি আত্মপ্রকাশ করিল সে ব্যক্তি হইয়া উঠিল।'

প্রথমপর্বের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে সন্ন্যাসীর ভ্রম সংশোধন মূলত তার ব্যক্তিগত উপলব্ধি জাত। জনতার চোখে সন্ন্যাসী প্রথমে যেমন অহেতুক পূজাস্পদ ছিল শেষেও তেমনি আছে। নাটকে কৃষকদের কণ্ঠে 'হেদে গো নন্দরানী' শীর্ষক গানটি নাটকের মূল ভাবাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু নাটকেই জনতা চরিত্রের ভাষায় শিষ্ট মানুষের সংলাপ আরোপ করেছেন। ফলে জনতা চরিত্র তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' দুই ব্রাহ্মণের কথোপকথন-

প্রথম: শাস্ত্রী বলেছেন স্থুল থেকে সূক্ষ উৎপন্ন হয়েছে।
দ্বিতীয়: গুরু বলেছেন সুক্ষ থেকে স্থুল উৎপন্ন হয়েছে।
প্রথম: সে যে অসম্ভব কথা।
দ্বিতীয়: সেই তো বেদবাক্য।
প্রথম: কেমন করে হবে? বৃক্ষ থেকে তো বীজ।
দ্বিতীয়: দূর মূর্খ বীজ থেকেই তো বৃক্ষ।

সাধারণ গ্রাম্য জনতার মুখে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে এই সূক্ষ্ম দার্শনিক বিশ্লেষণ প্রত্যাশিত নয়। শিষ্ট ভদ্রমানুষের আচরণের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে জনতা চরিত্র কিছুটা কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। নাটকে জনতা চরিত্রের কণ্ঠেও শোনা যায় কাব্যময় সংলাপ। রাজপুত্রের বিবাহ উপলক্ষে ছুটির আনন্দে ও পেট ভরে খাওয়ার আনন্দে উল্লসিত জনতার মুখে কোনো প্রতিবাদের ভাষা নেই।

'রাজা ও রানী'র জনতা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব। কুঞ্জরলাল কামারের নেতৃত্বে রাজবিদ্রোহে সমবেত হয়েছে জনতা, 'ভিক্ষে করে কিছু হবে না, আমরা লুঠ করব।' কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিবর্তে সাধারণ দরিদ্র প্রজারা সামান্য আশ্বাস পেলেই তারা বিদ্রোহের পথ থেকে ফিরে আসে। অশিক্ষিত গ্রাম্য জনসাধারণের এই বিশেষ মানসিকতা জনতা চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। হরিদীন কুমোরের পরামর্শ, 'ওরে তোরা মরতে বসেছিস নাকি? বলিস কী রে। আগে রাজাকে জানা, তারপরে যদি না শোনে তখন অন্য পরামর্শ হবে।' হরিদীন কুমোরের পরামর্শে মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে গেছে জনতার মন। অবশেষে শ্রীহরের পরামর্শে তারা আবার শাস্ত্র ফেলে অস্ত্র তুলে নিতে চেয়েছে রাজার বিরুদ্ধে। এখানে জনতা চরিত্রের বিশৃঙ্খল, সদা পরিবর্তনশীল মানসিকতাটি ফুটে উঠেছে। আবার চন্দ্রসেনের প্রতি জনতার অভিশাপ বাক্য- 'ধিক ধিক নিপাত যাও। কোটিকোটি জন্ম তোমার নরকবাস হোক। সিংহাসনের কীট, সিংহাসনকে জীর্ণ করে তার ধূলির মধ্যে তোমার বিলুপ্তি ঘটুক'-এ ভাষাও জনতার নয়।

'বিসর্জন' নাটকে রঘুপতি সাধারণ জনতার ধর্ম ভীরুতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের বুঝিয়েছেন যে, 'তিন মাসের মধ্যে মড়কে দেশ উচ্ছন্নে যাবে।' রঘুপতি জনতাকে রাজ বিদ্রোহের অংশীদার করতে চেয়েছেন। দেবী ত্রিপুরেশ্বরীর মুখ পিছনদিকে ঘুরিয়ে রেখে সে জনতার সন্দেহকে আরো বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে। তবু সাধারণ প্রজারা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়নি। রঘুপতির কথায় তারা সাময়িকভাবে হয়ত কিছুটা উত্তেজিত হয়েছে কিন্তু সৈন্য আগমনের সংবাদে প্রাণভয়ে ভীত জনগণ পালাতে চেয়েছে-

গণেশ: অস্ত্র কেন ঠাকুর?
রঘুপতি: মায়ের পূজা বন্ধ করার জন্য রাজার সৈন্য আসছে।
হারু: সৈন্য আসছে, প্রভু তবে আমরা প্রণাম হই।
কানু: আমরা কজন সৈন্য এলে কি করতে পারব?
হারু: করতে সবই পারি- কিন্তু সৈন্য এলে এখানে জায়গা হবে কোথায়? লড়াই তো পরের কথা, এখানে দাঁড়াব কোনখানে?

জনগণের এই ভীত সন্ত্রস্ত রূপটিই তাদের জীবনের স্বাভাবিক ছবি। 'মালিনী' নাটকেও অশিক্ষিত জনতার ধর্মান্ধ রূপটি নাটকে প্রস্ফুটিত হয়েছে। এখানে জনতা চরিত্রকে প্রকাশ্যে মঞ্চে আনা হয়নি। কিন্তু অন্যান্য চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে জনতা চরিত্রের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মালিনী রাজগৃহ ত্যাগ করে প্রকাশ্যে পথে বেড়িয়ে এলে যে জনগণ তার নির্বাসন চেয়েছিল দেবী জ্ঞানে তারাই আবার তার পূজা আরম্ভ করেছে। 'প্রজাগণ দরশন যাচে'–মালিনীকে অনায়াসেই দেবী রূপে স্বীকার করে নিয়েছে নিরীহ গ্রাম্য প্রজারা। প্রথম পর্বের রবীন্দ্রনাটকগুলিতে আবেগ তাড়িত, অসঙ্ঘবদ্ধ, অশিক্ষিত চরিত্রই উপস্থিত হয়েছে বেশি মাত্রায়। কিন্তু রূপকপ্রতীক নাট্যপর্ব থেকে আমূল পাল্টে গেছে জনতা চরিত্র। জনতা তখন আর নাট্য রসসৃষ্টির উপাদান নয়, বরং তারাই হয়েছে নাটকের বিষয় ও আশ্রয়। 'শারদোৎসবে' জনতাকে একটু লঘু ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে বটে, কিন্তু জনতা চরিত্রের সংস্কারমুক্ত রূপটিকেই ফুটিয়ে তোলার দিকে সেখানে ঝোঁক পড়েছে বেশি।

১ম ব্যক্তি: ওরে ছোড়াগুলো, সন্ন্যাসী কোথায় গেল রে?

২য় ব্যক্তি: কই বাবা, সন্ন্যাসী কই?

বালকগণ: এই-যে আমাদের সন্ন্যাসী।

১ম ব্যক্তি: ও তো তোদের খেলার সন্ন্যাসী! সত্যিকার সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন?

বাস্তবিক এ জনতা পূর্ববর্তী নাটকগুলির জনতার চেয়ে অনেক বেশি পরিণত। তাদের কথার মধ্যেও নেই পূর্বদিনের বাচালতা। চোখে নেই ভাব-বিহ্বলতা। জীবন ও মূল্যবোধ সম্পর্কে তারা অনেক বেশি প্রত্যয়ী।

'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের জনতা চরিত্রের কণ্ঠে আরোপিত হয়েছে বিদ্রোহের কাঠিন্য। তাদের প্রিয় নেতা ধনঞ্জয় বৈরাগীর জন্য তারা ততদিনে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। প্রকৃতপক্ষে এ জনতাকে আর বলা যাবে না ভীরু কাপুরুষ। ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে তারা 'মারের সাগর' পেরিয়ে যেতে উৎসাহ বোধ করেছে।

'রাজা' নাটকের জনতা আরো বেশি বুদ্ধিদৃপ্ত। বিভিন্ন শ্রেণির জনতার সমাবেশ ঘটেছে এই নাটকে- বিদেশী পথিক, নাগরিক দল, একদল পদাতিক, একদল স্ত্রীলোক, নাচের দল এবং আরও অনেক। বসন্ত পূর্ণিমার আনন্দ উৎসবের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জুড়ে যাচ্ছেন রাজা- যাকে দেখা যায় না কিন্তু যিনি আছেন। বাস্তবিক, বিচিত্র পর্যায়ের জনতা ছাড়া রাজা নাটকটি কল্পনা করা যায় না। এই নাটকে জনতা শিল্পবস্তুর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে উঠেছে। সাত রাজা যখন এক হয়ে লড়াইয়ে নেমেছে তখন তাদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও ঈর্ষার চিত্রটি ফুটে উঠেছে জনতার সংলাপে-

১ম: ওহে এতগুলো রাজা একত্র হয়ে লড়াই বাঁধিয়ে দিলে, ভাবলুম খুব তামসা হবে। কিন্তু দেখতে দেখতে কি যে হয়ে গেল, ভালো বোঝাই গেল না।

২য়: দেখলে না? ওদের, নিজেদের মধ্যেই গোলমাল বেধে গেল- কেউ যে কাউকে বিশ্বাস করে না।

১ম: ওরা তো লড়াইয়ের দিকে চোখ রাখেনি- ওরা পরস্পরের দিকেই চোখ রেখেছে।

২য়: কেবলই ভাবছিল- লড়াই করে মরবো আমি আর তার ফল ভোগ করবে অন্যজন।

এ নাটকে জনতা সবার আগে যুদ্ধে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। ঠাকুরদা জানিয়েছেন যে, 'সকলের আগে গিয়ে তারা দাঁড়ালো, সকলের আগেই তারা প্রাণ দিয়ে বসে আছে।'

'অচলায়তনে'র শোনপাংশুরা মাঠে মাঠে ফসল ফলায়। কঠিন ঘুমে অচেতন লোহা দিয়ে তারা লাঙলের ফলা বানায়। কিন্তু এই শোনপাংশুরা আবার যুদ্ধ জানে। অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙ্গে স্থবিরকদের জড় আশ্রমে এনেছে প্রাণের প্রবাহ। 'মুক্তধারা'য় শিবতরাইয়ের প্রজারাও রাজবিদ্রোহী। তাদের পেটের খিদের অন্ন তারা

রাজকোষে জমা দিতে চায়নি। মন্ত্রী রাজা রণজিৎকে পরামর্শ দেন, 'রাজকার্যে ছোটদের অবজ্ঞা করতে নেই। মনে রাখবেন, যখন অসহ্য হয় তখন দুঃখের জোরে ছোটরা বড়োদের ছাড়িয়ে বড়ো হয়ে ওঠে।' তারা কারাগার ভেঙ্গে যুবরাজকে মুক্ত করে আনতে যাত্রা করেছে।

বিষণ: কী করে?
সকলে: জোর করে।
বিষণ: রাজার সঙ্গে পারবি?
সকলে: রাজাকে মানিনে।

এই অমান্য করবার ঘোষণাটি খুব সহজ কথা নয়। যে জনতাকে 'রাজা ও রানী' তে দেখা গেছে, আবার 'বিসর্জনে'ও দেখা গেল, তার থেকে আরও অনেকখানি দূরে সরে এসেছে 'মুক্তধারা'র জনতা যেখানে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত আমাদের নিয়ে যেতে চান।

'রক্তকরবী' নাটকের মূল দ্বন্দ্ব যেখানে রাজার সঙ্গে তার নিজেরই সংঘাত সেখানে জনতার ভূমিকা একটু ভিন্ন রকম। রক্তকরবীর রাজা এত বেশি শক্তিশালী যে তার শাসন ব্যবস্থায় ফাঁক নেই; যেটুকুনিওবা আছে তা মদ, সোনা আর ধর্মের জপমালায় শৃঙ্খলিত। হঠাৎ নন্দিনীর আবির্ভাব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেও, মকররাজের ধ্বজা টলিয়ে দিলেও, কিছু জনতাকে আমরা দেখতে পাই সর্দারের অনুগামী। আবার খনিখোদাইয়ের দল ও ফসলকাতার দল রয়ে গেছে নাটকের নেপথ্যে। নন্দিনীর পৌষ ডাকার গান হয়ে উঠেছে বৃহত্তর ভাব ব্যঞ্জনায় গ্রামীন কৃষক সমাজের গান। এই নাটকে জনতা প্রচ্ছন্ন, তাদের ক্রিয়া স্পষ্ট। জনতাকে অলক্ষ্যে রেখে ব্যবহার রবীন্দ্রনাটকে প্রথম ও নতুন। শাসক শক্তির সঙ্গে শোষিত জনগোষ্ঠীর পরস্পর বিরুদ্ধ সংগ্রামে জনতার একটা ভূমিকা থাকেই। প্রত্যক্ষ এই আন্দোলনে জনতার যে চরিত্র ধরা পড়ে, সেখানে হয় তারা ভীতু বা কোথাও অত্যুৎসাহী। আবার সন্ন্যাসী বা ঠাকুরদার মত এক এক জন জননেতাও রবীন্দ্রনাটকে বারবার দেখা যায়। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার নিষ্পেষণে কেমন করে বলি হয় সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ প্রকৃতপক্ষে তারই মূর্তিমান প্রতীক হিসেবে উপস্থিত হয়েছে রক্তকরবী নাটকে।

রবীন্দ্রনাটকে সাধারণ গ্রাম্য জনতার হাস্যরসাত্মক উপস্থিতি থেকে শুরুকরে নির্যাতিত জনতা ক্রমশ বলিষ্ঠ ও প্রতিবাদী হয়ে ওঠাতেই আটকে থাকেনি। কালের বিবর্তনে এসকল সাধারণ জনতাই সভ্যতার চালিকা শক্তি রূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে। 'রথের রশি'তে রুদ্ধ রথের চাকা ব্রাহ্মণ সৈনিক কারো চেষ্টাতেই চলেনি, শূদ্র পাড়া থেকে হাজার হাজার লোক এসে রথের রশিতে হাত দিয়েছে। তাদের স্পর্শেই রথ এগিয়ে চলেছে।

"যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে,
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে
তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।"

গ্রন্থপঞ্জি:

১. বিশী, প্রমথনাথ। রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৪।
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ (২ খণ্ড)। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০৬।
৩. মৈত্র, সুরেশচন্দ্র। বাংলা নাটকের বিবর্তন। রত্নাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০।

৪. ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)। এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ, ২০০৯।

৫. ঘোষ, অজিতকুমার। বাংলা নাটকের ইতিহাস। দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০।

৬. সেন, সুকুমার। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড)। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০৭।